একক ৪৪ ❐ পাশ্চাত্যকরণ ও ভারতীয় সমাজে তার প্রতিক্রিয়া : তিনটি ভিন্নমুখী উদ্যম ও প্রয়াস : সমন্বয়বাদ, রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থা, চরমপন্থী প্রতীচ্যপন্থা

গঠন ঃ

৪৪.০ উদ্দেশ্য
৪৪.১ প্রস্তাবনা
৪৪.২ সমন্বয়বাদ
৪৪.৩ রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থা
৪৪.৪ চরমপন্থী প্রতীচ্যপন্থা
৪৪.৫ সারাংশ
৪৪.৬ অনুশীলনী
৪৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- পাশ্চাত্যকরণের ফলে বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ?
- রাজা রামমোহন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনচর্চা ও চর্যার মধ্যে কিভাবে সুখী সমন্বয় আনার চেষ্টা করেছিলেন ?
- রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বে হিন্দু রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থা প্রগতিশীলতার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ?
- ডিরোজিওর প্রেরণায় কিভাবে চরমপন্থী প্রতীচ্যবাদের বিকাশ ঘটেছিল।

৪৪.১ প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের ভারতের মনন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এর পিছনে ছিল পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটি পরাজিত জাতির বেদনাবিদ্ধ চৈতন্য। আর এই দু'টি ব্যাপার সংযুক্ত হয়েই এক নতুন মনন ও মেজাজের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। ভারতের মতো বিশাল ভৌগোলিক আয়তনের একটি দেশ মুষ্টিমেয় বিদেশীর করতলগত হয়েছিল শুধুমাত্র আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর দুর্বলতার কারণে, এই বেদনাবিধুর স্মৃতি

দেশবাসীকে নিরন্তর পীড়া দিত। নব্যশিক্ষিত আধুনিক চিন্তাঋদ্ধ ভারতীয়রা এদেশের দুর্বলতা-সচলতার নানা চিহ্ন ধরে তার কারণ অনুসন্ধান শুরু করলেন। অনেকেই এই আত্মানুসন্ধান শেষে সিদ্ধান্ত করলেন যে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আমাদের গ্রহণীয় কিছু নেই ; আমাদের অতীত ঐতিহ্যেই আছে উন্নয়নের হাতিয়ার ; অতীতের পুনর্মূল্যায়নের মধ্যেই আছে আত্মসম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায়। তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ রইলেন। বস্তুত বিদেশী শাসকের কাছে পরাধীন ভারতে এটি ছিল একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এই দলকে আমরা রক্ষণশীল ঐতিহ্যপ্রিয় দল বলতে পারি। আর একটি গোষ্ঠী পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ আর বিজ্ঞানকে যথেচ্ছভাবে কাজে লাগিয়ে দাবি করেছিল আমূল সামাজিক সংস্কার। তাঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্যায় ও অযৌক্তিক ভারতীয় প্রথা ও প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। এই গোষ্ঠীকে আমরা চরমপন্থী প্রতীচ্যপন্থী বলতে পারি। তৃতীয় আর একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এই পাশ্চাত্যীকরণ পর্বে যে প্রবণতার মর্মবস্তু হল রক্ষণশীল ঐতিহ্যশীলতা আর চরমপন্থী প্রতীচ্যবাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো। এরা ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদে বিশ্বাসী।

তবে এই তিনটি প্রবণতার প্রবক্তাদের সুস্পষ্ট বিভিন্ন তায় চিহ্নিত করা যায় না ; কেন না এই তিনটি গোষ্ঠীর মধ্যেই আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। পশ্চিমী সভ্যতার অভিঘাতে এ-দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 'নবজাগরণ' ঘটেছিল তা ঐতিহাসিক সত্য ; কিন্তু এই জাগরণের তল ও তাপমাত্রায় নানা পরস্পরবিরোধী মাত্রা ছিল। রক্ষণশীল ঐতিহ্যপ্রিয় প্রবণতায় লক্ষ্য করা গেল অতীতের গৌরবগাথা। ভারতবর্ষের অতীত মহিমা লক্ষ্য করা হল হিন্দু গৌরবোজ্জ্বল অতীতের মধ্যে। ভারতবর্ষের সভ্যতা মানেই তাঁরা তুলে ধরলেন হিন্দু সংস্কৃতির গৌরবময় অতীতকে। অন্যদিকে চরমপন্থী প্রতীচ্যপন্থীরা ভারতীয় অতীতকে সমগ্রতায় পুজো করতে চাইলেন না। তাঁরা প্রমাণ করলেন হিন্দু ঐতিহ্যের অনেক কিছুই অন্যায়, অযৌক্তিক, সেকেলে। তাঁরা অনড়, বাধ্যতামূলক পুরোহিততন্ত্রকে আঘাত করলেন, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিন্যাসকে বললেন অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্যের প্রতি দেখালেন নিরঙ্কুশ পক্ষপাত। এই অন্ধ পক্ষপাতিত্ব থেকে জন্ম নিয়েছিল এক ধরনের জঙ্গী সংগ্রামের মেজাজ বা যুক্তিবাদকে সরাসরি অস্বীকার করেছিল। তৃতীয় পন্থার যাত্রীরা উদারনৈতিক আধুনিকতা আর রক্ষণশীল ঐতিহ্যপ্রিয়তার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা একদিকে যেমন হিন্দু ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে পারেননি, অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ মানবাধিকারকেও বরণ করেছিলেন। পরস্পরবিরোধী এই দুটি ধারণার সহাবস্থান ও বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্ব, বস্তুত, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিরই অনিবার্য পরিণাম।

৪৪.২ সমন্বয়বাদ

ভারতের এই চিন্তা ও চৈতন্যের প্রধান প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায়। ভারতবর্ষের অধঃপতিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নচিন্তা ছিল রামমোহনের জীবনসাধনা। জাতিভেদ প্রথা ও অন্ধ কুসংস্কারের গ্লানিক্লিষ্ট ভারতের সামাজিক বন্ধতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন। সেকালে প্রচলিত ধর্ম ছিল কুসংস্কারে আবদ্ধ ; অজ্ঞ ও ভণ্ড পুরোহিতরা সমাজ-কাঠামো ও সমাজব্যবস্থাকে নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে স্থিরসংকল্প ছিলেন। উচ্চবংশীয় হিন্দুরা ছিলেন স্বার্থান্বেষী ও

সমাজের বৃহত্তর উন্নয়নের প্রতি বিমুখ। প্রাচ্যের দার্শনিক উপলব্ধি ও সনাতন ধর্মের প্রতি রামমোহনের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের একমাত্র উপায় হলো পাশ্চাত্যের বিজ্ঞাননিষ্ঠ জীবনচর্যা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ ছাড়া ভারতবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এদেশের নরনারী সামাজিক সাম্য ও মানবিক মযর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পাশ্চাত্যের জীবনধর্ম অপরিহার্য। তিনি পশ্চিমী বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রেরও গুণগ্রাহী ছিলেন।

রামমোহন চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনচর্চা ও চর্যার মধ্যে সুখী সমন্বয়। তিনি বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তরুণ বয়সে বারাণসীতে তিনি সংস্কৃত ও হিন্দুশাস্ত্রে পাঠ নিয়েছিলেন। পাটনায় অধ্যয়ন করেছিলেন কোরান ও আরবি-ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য। জৈনধর্ম প্রমুখ ভারতের বিভিন্ন ধর্মমত ও বিশ্বাসে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিমী চিন্তা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি অধ্যয়ন করেন। মূল বাইবেল অধ্যয়ন করার জন্য তিনি গ্রিক ও হিব্রুভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফার্সি ভাষায় রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার'। এই রচনায় তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন সব ধর্মেরই স্বাভাবিক প্রবণতা হলো একেশ্বরবাদ। কিন্তু মানুষ চিরকালই নিজের নিজের বিশেষ ধর্মমত ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলির উপর জোর দিয়ে এসেছে আর সেইজন্যই ধর্মে ধর্মে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে।

১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে একদল তরুণ সংঘবদ্ধ হলেন, আর এইভাবে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠল 'আত্মীয় সভা'। এরপর থেকেই তিনি সচেতনভাবে হিন্দুধর্মের সাম্প্রতিক বিকৃতিগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। মূর্তিপুজা, জাতিভেদপ্রথা আর অর্থহীন নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলেন তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠ শানিত যুক্তি। পুরোহিতদের তিনি তীব্রভাষায় নিন্দা করলেন। কেননা তাঁর মতে, পুরোহিতরাই এইসব অন্ধ আচার-অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করেছে। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি বেদান্তের এবং প্রধান পাঁচটি উপনিষদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করলেন এবং প্রমাণ করলেন যে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রেই একেশ্বরবাদের কথা বলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্তিপুজার অযৌক্তিকতাও প্রমাণ করলেন। তিনি বললেন, মূর্তিপূজা সমাজের বিন্যাসটি ধ্বংস করে দেয় এবং নৈতিক সংস্কারের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে। প্রোটেস্ট্যান্ট বিপ্লবের প্রাণপুরুষ মার্টিন লুথারের মতোই তিনি মনে করতেন, যে-কোন ধর্মগ্রন্থেই ভুল থাকতে পারে ; কিন্তু সেই ভুল বা বিচ্যুতি সংশোধন বা পরিত্যাগ করার অধিকার মানুষের সহজাত, বিশেষত, যদি তা সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় হয়ে ওঠে।

রামমোহন তাঁর যুক্তিবাদী মননকে শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের গ্লানি সংস্কারেই আবদ্ধ রাখেননি ; তিনি খ্রিস্টান ধর্মেরও উদারনৈতিক পুনর্ব্যাখ্যা করলেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রকাশ করলেন 'যিশুর অনুশাসন' (Precepts of Jesus)। এই গ্রন্থে তিনি নিউ টেস্টামেন্টের (New Testament) নৈতিক অনুশাসন এবং দার্শনিক প্রত্যয়গুলিকে আলাদা করলেন ; বললেন যে খ্রিস্টধর্মের নৈতিক বাণীগুলি অলৌকিক গল্পগাথার থেকে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিস্টধর্মের প্রচারকরা রামমোহনের এহেন অখ্রিস্টানসুলভ বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়। অতঃপর রামমোহন ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'খ্রিস্টানদের

প্রতি আবেদন' শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারকদের প্রচারিত অন্ধবিশ্বাস ও রহস্যময়তা প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন এইসব রচনায়। রামমোহন প্রকৃত খ্রিস্টীয় আদর্শের বিরোধী ছিলেন না। তিনি বরং খ্রিস্টধর্মের নৈতিক শিক্ষাগুলি হিন্দুধর্মের অন্তর্গত করতে চেয়েছিলেন।

হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে রামমোহন একটি বিশ্বজনীন ধর্ম গড়ে তুলতে চাইছিলেন। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি' (Different Modes of Worship) রচনায় তিনি বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতি সহনশীলতা আদর্শের উপর জোর দেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ব্রাহ্মসভা' নামে একটি একেশ্বরবাদী সংগঠন গড়ে তুললেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল একটি নিয়মিত উপাসনাগৃহ। এই উপাসনাগৃহের দলিলেই 'ব্রাহ্মসমাজে'র নীতিগুলি সুনির্দিষ্ট হল। ব্রাহ্মসমাজের নীতিগুলির ভিত্তি হল যুক্তিবাদ, বৈদিক ও ঔপনিষদিক আদর্শ, মানবিক মর্যাদা, পৌত্তলিকা বিরোধিতা এবং সতীদাহ ইত্যাদি সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধতা। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'সতীদাহ'-এর বিরুদ্ধে প্রথম জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের নানা উদ্ধৃতির মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে এই হত্যাপ্রথার সমর্থন আমাদের সর্বোত্তম ধর্মশাস্ত্রে নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিধবাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে স্বাধীন বিচারশক্তি ও শুভবুদ্ধির উদ্বোধনের আহ্বান জানালেন। শেষপর্যন্ত লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। গোঁড়া হিন্দুরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই আইন রদ করার জন্য আবেদন জানালেন। রামমোহনও এই আইনের সমর্থনে একটি ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করলেন ; বেন্টিঙ্কের আইন যাতে প্রত্যাহৃত না হয় সেজন্য পার্লামেন্টেও তিনি আবেদনপত্র পাঠালেন। সতীদাহপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের সাথে সাথে তিনি নারীদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্যও আন্দোলন শুরু করেন। বহুবিবাহ প্রথাকে তিনি নিন্দা করলেন কঠোর ভাষায়। নারীদের সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের সপক্ষেও তিনি জোরাল বক্তব্য রেখেছিলেন।

ভারতে আধুনিক ধ্যানধারণা প্রসারের উপায় হিসাবে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাকেই অন্যতম হাতিয়ার বলে গণ্য করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্যের প্রজ্ঞার সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ। তাই একদিকে যেমন নিজে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল চালাতেন, তেমনি অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বেদান্ত মহাবিদ্যালয়। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হেয়ার প্রমুখ অনেকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে রামমোহন সক্রিয়ভাবে সাহায্য করলেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা একটি চিঠিতে রামমোহন আবেদন করেছিলেন ধ্রুপদী প্রাচ্যবিদ্যার পরিবর্তে কার্যকরী পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যই সরকারের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রবর্তনাও হয়েছিল রামমোহনের হাতে। বিভিন্ন অনুবাদ, ভূমিকা ও গবেষণামূলক নিবন্ধে রামমোহন এনেছিলেন প্রকাশভঙ্গীর অভিনব বলিষ্ঠতা, প্রমাণ করেছিলেন গুরুগম্ভীর বিষয় প্রকাশেও বাংলাভাষা রীতিমতো পরাঙ্গম।

রামমোহনের মধ্যেই জাতীয় চৈতন্য উন্মেষের প্রথম উদ্ভাসটি পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীন ও তেজস্বী ভারতের ভবিষৎ রূপকল্প তিনি যেন চোখের সামনে দেখাতে পেতেন। তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করেছিলেন মূর্তিপূজার অশুভ প্রভাবের বিরুদ্ধে ; তাঁর কণ্ঠে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছিল জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে, কেননা, তাঁর বিচারে জাতিভেদ প্রথাই হল আমাদের অনৈক্যের মূল কারণ। তিনি ছিলেন ব্যক্তি-

স্বাধীনতার পূজারী ; সংবাদপত্রের অবাধ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার সপক্ষে তিনি সুপ্রীম কোর্টে পাঠিয়েছিলেন একটি স্মারকলিপি। জুরি আইনের (Jury Act) বৈষম্যের বিরুদ্ধেও তিনি সরব হয়েছিলেন। কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকারের অবলুপ্তি এবং রপ্তানির উপর বিপুল শুল্কের অবসানও তিনি দাবি করেছিলেন। এদেশে রাজস্ব ও বিচারব্যবস্থা এববং রায়তদের দুরবস্থার কথা পেশ করেন তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। জমিদারী অপশাসনের বিরুদ্ধেও তিনি সরব ছিলেন ; কৃষকদের জন্য সুস্থির কর নির্ধারণ দাবি করেন।

রামমোহনের আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পরিধিটি ছিল সুবিপুল। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রগতিশীল আন্দোলন সম্পর্কে ছিল তাঁর প্রগাঢ় ঔৎসুক্য। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে নেপল্‌স্-এর বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার সংবাদে তিনি এতই ব্যথিত হন যে পূর্বনির্ধারিত যাবতীয় কর্মসূচি তিনি বাতিল করে দেন। আবার ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে স্পেন অধিকৃত আমেরিকার বিপ্লবের সংবাদে তিনি এতই উৎফুল্ল হন যে ঐ বিপ্লবের সম্মানে তিনি একটি গণভোজের ব্যবস্থা করলেন। আয়ার্লান্ডের দুর্দশাপীড়িত কৃষকদের সমর্থনে তিনি ইংরেজ জমিদারদের তীব্র নিন্দা করলেন ; তিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন পার্লামেন্ট যদি সংস্কার বিল (Reform Bill) পাশ না করে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবেন। বস্তুত সবদিক থেকেই রামমোহন ছিলেন আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম 'আধুনিক' মানুষ, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞাননিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত।

বাংলার রেনেশাঁস বা নবজাগরণে রামমোহন পথিকৃৎ হলেও তাঁর সহযাত্রীর অভাব ছিল না। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধাদের মধ্যে যেমন ছিলেন ভারতীয় তেমনি অ-ভারতীয় সহযোগীও ছিলেন। আমরা ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ বিভিন্ন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রগতিশীল মানুষদের নাম করতে পারি। আর এখানেই ছিল বাংলার এই নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা, পনেরো শতকে ইওরোপীয় রেনেশাঁস যখন ইতালিতে শুরু হয় তার প্রধান চালিকাশক্তি ছিল বাণিজ্যিক বুর্জোয়া সম্প্রদায় ; ভূমিস্বার্থের সঙ্গে এই বুর্জোয়াশ্রেণীর কোন সংযোগ ছিল না। ইওরোপীয় বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা ছিল নিজের দেশে স্বাধীন ব্যবসায়ী। কিন্তু রামমোহন, দ্বারানাথ সহ সেকালের বাঙালী রেনেশাঁস পুরুষদের ব্যবসায়ী স্বার্থ ছিল ইংরেজদের বাণিদিজ্যক স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। তাঁরা ইংরেজদের মুৎসুদ্দী হিসেবেই নিজেদের ধনস্প্দ বৃকি্ধতে উৎসাহিত এই বিবেচনায় যে তাঁদের সম্পদ বৃদ্ধি মানেই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি। কিন্তু বাস্তবে যে প্রক্রিয়ায় তাঁরা তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করেছিলেন সে প্রক্রিয়ার মধ্যে দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির অনিবার্য ধ্বংস নিহিত ছিল। ইওরোপীয় রেনেশাঁসের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি রেনেশাঁস নেতাদের ধর্মপ্রভাব মুক্ত স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। কিন্তু বাংলার রেনেশাঁস পুরুষদের ক্ষেত্রে তেমন সচেতন প্রয়াস দেখা যায় না। উপরন্তু, তাঁদের অর্থনৈতিক জীবন যেহেতু ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল তাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল কিভবে ইংরেজ শাসনকে স্থায়ী ও সুস্থির করা যায়—এমন অভিযোগ করা হয়। বলা হবয়, ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ তাঁরা কামনা করেননি ; তাঁদের ইংরেজ সমালোচনা কতকগুলি ঔপনিবেশিক দুষ্কৃতির কাণ্ডকে সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরিশেষে, ইওরোপীয় রেনেশাঁস মানবতার সঙ্গে বাঙলার মানবতাবাদী চিন্তা ও কর্মের সাদৃশ্য খোঁজা হয়। এই সাদৃশ্য ইতিহাসসম্মত

নয়। কেননা, ইতালিতে মানবতাবাদী চৈতন্যের বিকাশের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা, বাণিজ্যিক বুর্জোয়াদের উদ্ভব ও ভূমিদাস স্বার্থের মধ্যে একটি গভীর সংযোগ লক্ষ করা যায়। এই সংযোগের মধ্যেই সমাজের যাবতীয় মানুষের শোষণমুক্তির সংকল্প ছিল। রেনেশাঁস নায়করা একধরনের কল্পিত সাম্যবাদের তত্ত্ব উদ্ভান করে সমস্ত মানব-শোষণের অবসান ঘটাতে চেয়েচিলেন। কিন্তু এধরেনর প্রস্তাব বাঙলার মানবতাবাদে ছিল না। বাঙলার মানবতাবাদের প্রধান উদ্দেস্য ছিল বাঙালী অভিজাত ও মদ্যশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থকে সংহত করে তার পরিপূর্ণ বিকাশের উপযোগী যাবতীয় সামাজিক বাধা অপসারণ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সংস্কৃত কলেজে যখন সকল বর্ণের ছাত্রদের ভর্তির প্রশ্ন ওঠে তখন রক্ষণশীল হিন্দুরা তা তীব্র বিরোধিতা করে। বিদ্যাসাগরও প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সংস্কৃত কলেজের দরজা সবার জন্য খুলে দিতে পারেননি ; শেষমেশ তিনি শুধুমাত্র কায়স্থদের ভর্তির প্রস্তাব দিতে পেরেছিলেন।

৪৪.৩ রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থা

ইংরেজ শাসনের ভিন্ন যে-একটি প্রতিক্রিয়া এদেশের সমাজে লক্ষ্য করা গিয়েছিল তাকে আমরা রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থা বলে অভিহিত করেছি। রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থীরা রামমোহনের সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে নানাভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। আর বড়ো কথা, তারা রামমোহনকে প্রকাশ্য রাজপথে লাঞ্ছিত করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। রামমোহনের প্রগতিপন্থার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শোভাবাজার রাজবাড়ির বংশধর নিষ্ঠাবান হিন্দু রাধাকান্ত দেব। রাধাকান্ত প্রাচ্য সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি একটি সংস্কৃত জ্ঞানকোষ (encyclopaedia) সংকলন শুরু করেন। এতে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আরবি, ফার্সিতে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল ; ইংরেজী সাহিত্যেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে তিনি সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজেও তাঁর প্রচুর দান ছিল। কলকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির (Calcutta School-Book Society) তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নারীশিক্ষার প্রসারেও তাঁর উৎসাহের শেষ ছিল না।

রাধাকান্ত দেব এই আপাত প্রগতিশীলতার অন্তরালে ছিল পুরোদস্তুর প্রতিক্রিয়াশীলতা। সামাজিক রক্ষণশীলতার তিনি ছিলেন অন্ধ সমর্থক। যদিও তাঁর পরিবারে কেউ 'সতী' হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না, তবুও সতীদাহ প্রথাকে প্রচলিত রাখতে তিনি গোড়াপন্থীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার বিরুদ্ধে যে রক্ষণশীল হিন্দুদের আবেদনপত্তরটি রচিত হয়েছিল (১৮২৯ খ্রিঃ) তাতে রাধাকান্তের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রাধাকান্তের নেতৃত্ব গঠিত হয়েছিল রক্ষণশীল হিন্দুদের ধর্মীয় সংগঠন 'ধর্মসভা'। 'ধর্মসভা'য় যোগ দিয়েছিলেন ধনী হিন্দু জমিদাররাও। কেননা সরকারের নতুন রাজস্বনীতি (Regulation III of 1828) তাদের মনঃপূত হয়নি ; সরকার 'সতীদাহ' আইন করে বন্দ করে দিলে, 'ধর্মসভা'য় যোগ দিয়ে তাঁরা সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতার সুযোগ পেয়েছিল। 'সমাচার চন্দ্রিকা' ছিল এই সংগঠনের প্রধান মুখপত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর সম্পাদক এবং 'ধর্মসভা'র কর্মসচিব। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে 'ধর্মসভা' সিদ্ধান্ত য়ে যে যে-সব হিন্দুরা সতীদাহ বন্ধে সহযোগিতা করবে 'ধর্মসভা' তাদের সামাজিক দিক থেকে বয়কট করবে। ব্রাহ্ম কেশব সেনের পিতামহ

রামকমল সেন ছিলেন আর একজন রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থীদের নেতা। তবে তিনি রাধাকান্ত দেবের মতো বিভিন্ন পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৪৪.৪ চরমপন্থী প্রতীচ্যপন্থা

এদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার তৃতীয় যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল হিন্দুসমাজে তাকে আমরা চরমপন্থী প্রতীচ্যপন্থা বলতে পারি। রামমোহনের জীবৎকালেই এই প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছিল। হিন্দু কলেজের বেশ কিছু তরুণ ছাত্রদের মধ্যেই এই চরমপন্থার বিকাশ ঘটেছিল ; তা ক্রমে একটি অভিনব আন্দোলনের রূপ নেয় এবং 'ইয়ং বেঙ্গাল' আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। 'ইয়ং বেঙ্গাল' আন্দোলনের মুখ্য প্রেরণাদাতা ছিলেন জনৈক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান—হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

ডিরোজিওকে বলা যেতে পারি বিস্ময়বালক। বাল্যকার থেকেই তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল সাহিত্য ও দর্শনপ্রীতি, ফরাসি বিপ্লব আর ইংরেজ র‍্যাডিক্যাল মতবাদে বিশ্বাস। হিন্দু কলেজে তিনি যখন শিক্ষক নিযুক্ত হলেন তখন তাঁর 'কৈশোর' শেষ হয়নি। হিন্দু কলেজে তিনি এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, যুক্তিবাদ আর চিন্তার স্বাধীনতা ছাত্রদের দুর্বার আবেগে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তিনি ছাত্রদের শেখাতেন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে। প্রচলিত রীতিনীতি সম্বন্ধে অবাধে প্রশ্ন তুলতে, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে। ইয়ং বেঙ্গাল গোষ্ঠীর সদস্যরা এদেশের চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। গোটা হিন্দুসমাজকেই তারা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে অস্থির করে তুলেছিল। হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয়ে তাদের ছিল প্রবল আসক্তি।

ডিরোজিও'র ছাত্ররা তাঁরই উৎসাহ ও প্রেরণায় গড়ে তোলে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে এক বিতর্ক সভা। তাঁরই সভাপতিত্বে এখানে চলত ঈশ্বরের পক্ষে-বিপক্ষে, মূর্তিপুজা ও পুরোহিততন্ত্রের ক্ষতিকর দিকগুলি নিয়ে সুদীর্ঘ তর্কবিতর্ক। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তারা চালু করে 'পার্থেনন' পত্রিকা যাতে স্ত্রীশিক্ষা, কুসংস্কারের সর্বনাশা প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হত। তাদের কথাবার্তায়, রচনায় ও বিতর্কে লক্ষ করা যেত বেকন, লক, হিউম, পেইন অথবা বেন্থামের রচনা অধ্যয়নের গভীর ছাপ। স্বভাবতই তাদের মনোভাবে একটি র‍্যাডিক্যাল ধারা মাথা তুলতে শুরু করে।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীনপন্থীরা সচকিত হয়ে ওঠেন। ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের সম্বন্ধে নানা গল্পগাছা ও গুজবও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হিন্দু কলেদ কর্তৃপক্ষ আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং ছাত্রদের মধ্যে হিন্দুদের ধারণাবিরোধী কাজকর্ম ও প্রচারের জন্য ডিরোজিওকে দায়ী করা হয়। ডিরোজিওকে তরুণ ছাত্রদের শিক্ষাদানের পক্ষে অযোগ্য বলে ঘোষণা করে কলেজ কমিটিতে প্রস্তাব আনা হয়। শেষপর্যন্ত ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ ছাড়তে হয়েছিল ; কিন্তু তরুণদের উপর তাঁর প্রভাব রয়েই গেল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নব্যবঙ্গ-এর সদস্যরা প্রচলিত সমাজ ও ধর্মব্যবস্থার নিন্দা ও সমালোচনা করে প্রাচীনপন্থীদের উত্যক্ত করে তুললেন।

ডিরোজিও পন্থীদের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনাও ছিল। পুলিশী দুর্নীতি ও

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষকদের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রসিকৃষ্ণ মল্লিক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, দাসপ্রথার অবসান ও সমানাধিকারের প্রশ্নেও তাঁরা সবর ছিলেন। অন্যায় করের বোঝার বিরুদ্ধে তাঁরা যেমন প্রতিবাদ করেছেন, তেমনি বিধবা বিবাহকেও তাঁরা জানিয়েছেন নীতিগত সমর্থন। আইন প্রণয়নে ভারতীয়দের অনধিকার, যাবতীয় বড়ো ও মাঝারি চাকুরিতে শ্বেতাঙ্গদের একচেটিয়া নিয়োগ, বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া কর্তৃত্ব, বিচার-ব্যবস্থায় ব্যয় ও বিলম্ব, দেশ থেকে ধননির্গমন—সমস্ত কিছুই তাদের নজরে পড়েছিল। জমিদারদের বিরুদ্ধে তারা প্রজাদের হয়ে নালিশ করেছেন, চেয়েছেন স্ত্রীশিক্ষার পবি্সাতর, চেয়েছেন জাতিভেদ বিলোপ। দৃষ্টিভঙ্গির এইসব পরিবর্তন এনে ইংয় বেঙ্গাল গোষ্ঠী অবশ্যই একটি আধুনিকতার বাতাবরণ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলেন।

ডিরোজিওপন্থীরা বাঙলার সমাজজীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা শেষপর্যন্ত অন্তঃসারশূন্য ও ক্ষণস্থায়ী বলে প্রমাণ হল। নব্যবঙ্গোর সদস্যরা নিজস্ব গোষ্ঠীর বাইরে কোন অর্থপূর্ণ আন্দোলন তো গড়ে তুলতে পারেননি, উপরন্তু নিজেরাই শেষপর্যন্ত কোন তাৎপর্যপূর্ণ চেহারা নিয়ে টিকে থাকতে পারেনি। ব্যক্তিগত অর্থ ও স্বার্থচিন্তায় তারা ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছিলেন, কেননা তারা অধিকাংশই এসেছিলেন বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। তারা প্রচলিত সামাজিক প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু তা উচ্ছেদের জন্য কোন বলিষ্ঠ বিদ্রোহ করতে পারেননি, বরং প্রথাগুলিকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া হিন্দু ঐতিহ্য ও জীবনধারার প্রভাবে এদের প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছিল হিন্দু ধর্ম ও সমাজজীবনের বিরুদ্ধেই ; এদেশের মুসলমানরা এদের থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। আসলে, 'ইয়ং বেঙ্গাল'-এর সীমাবদ্ধতা এই গোষ্ঠীর নিজস্ব সীমাবদ্ধতা নয়, তা উদ্ভূত হয়েছিল আমাদের সামগ্রিক রেনেশাঁসের সীমাবদ্ধতা থেকেই। ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও বৈদেশিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য ভাবধারা শেষপর্যন্ত বিমূর্তই থেকে গেল। বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পারল না। কেননা, পরাধীন ভারতে ছিল না খোলা প্রতিযোগিতা, চুক্তির প্রাধান্য, সকল নাগরিকের প্রতি আইন ও বিচারের সমভাবে প্রয়োগ। ছিল না সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা। সুতরাং পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে পশ্চিম থেকে ধার করে আনা ধারণা এদেশে অধরাই রয়ে গেল। ডিরোজিওপন্থীরা এদেশের বুদ্ধিরাজ্যে রয়ে গেল শেকড়হীন উদ্বাস্তু হিসেবে।

৪৪.৫ সারাংশ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জনজাগরণের সূচনা হলো। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে গতানুগতিকতার পরিবর্তে স্থান পায় অনুসন্ধানী মনোভাব ও যুক্তিবাদ। উন্মোচিত হয় সমাজব্যবস্থার ত্রুটি ও অবক্ষয়। ভারতীয় চিন্তাবিদরা এইসব বিচ্যুতির গভীর পর্যালোচনা করে তা নিশ্চিহ্ন করতে সচেষ্ট হলেন। ভারতীয় তথা বাঙালীদের একটি বিরাট অংশ পশ্চিমী ধ্যানধারণার সঙ্গো বিরোধিতা করে চিরাচরিত ধারণা,স সংস্থার প্রতি আস্থআবান রইলেন। অপর একটি অংশ সামাজিক পুনরুজ্জীবনের জন্য পশ্চিমী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এই দুই মেরুর মধ্যবর্তী শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচ্য পাশ্চাত্যের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে সমমন্বয়ে প্রয়াসী হলেন। পাশ্চাত্যের

জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্তিবাদ ভারতবাসীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল কিন্তু কিছুসংখ্যক ভারতীয় পাশ্চাত্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশের সভ্যতার ও সংস্কৃতির উগ্র সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। এসত্ত্বেও পাশ্চাত্যকরণের ফলে যে নবজাগরণের ঢেউ এলে তাতে উন্মেষ হল রাজনৈতিক চেতনার, বিকশিত হল জাতীয়তাবাদ। তাই একথা অনস্বীকার্য, পাশ্চাত্যকরণ ও পশ্চিমীশিক্ষা বাংলার জনগণকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করে গেল।

৪৪.৬ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। 'ব্রাহ্মসমাজ' আন্দোলনের সামাজিক তাৎপর্য কী ছিল? এই আন্দোলনের প্রতি সনাতন হিন্দু সমাজের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

২। আধুনিকীকরণের পথিকৃৎ রূপে রামমোহন রায়ের ভূমিকার সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করুন।

৩। উনিশ শতকের বাংলার সমাজচিন্তায় ডিরোজিওপন্থীরা কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিলেন?

৪। উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে 'নবজাগরণ' আখ্যা দেওয়া কতটা সঙ্গত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'নব্যবঙ্গ' আন্দোলনকে কি আমূল পরিবর্তনপন্থী আন্দোলন বলা যায়?

২। বাংলার 'নবজাগরণের' আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের স্বরূপ কী ছিল?

৩। বাংলার 'নবজাগরণ' কোন্ কোন্ দিক থেকে ইওরোপীয় রেনেশাঁসের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। 'ব্রাহ্ম সভা'র প্রতিষ্ঠাতা কে?

২। 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের সূচনা কে করেছিলেন?

৩। 'ধর্মসভা' কি?

৪। সতীদাহ প্রথা কবে আইনত নিষিদ্ধ হয়?

৫। 'পার্থেনন' পত্রিকা কারা চালু করেছিল?

৪৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Jones, Kenneth : *Socio-Religious Reform Movements in British India,* 1989.

২। Desai, A. R. : *Social background of Indian Nationalism.*

৩। Ahmed, A. F. Salahuddin : *Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835,* 1965.

৪। সরকার, সুশোভন : *বাংলার রেনেশাঁস,* ১৩৯৭।

৫। ত্রিপাঠী, অমলেশ : *ইতালীর রেনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি,* ১৯৯৪।